মুকুল দে-র শিল্পী জীবনের পটভূমিকায় জাপান ও অজন্তা

শিল্পী মুকুল দে-র জীবনের একটি অধ্যায় সন্ধিনী রায়চৌধুরী-র কলমে।

১৯১৬ সালের শুরুর দিকে মুকুল দে যখন ছবি আঁকা শিখবেন বলে পাকাপাকিভাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য পিতার কর্মস্থল ঘাটশিলায় গিয়ে থাকতেন তখনই একদিন শান্তিনিকেতন থেকে গুরুদেবের টেলিগ্রাম এলো "কাম ইমিডিয়েটলি উইথ ইয়োর লাগেজেস্, প্রসিডিং টু জাপান।" টেলিগ্রাম হাতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা মুকুলের তখন জাপান সম্পর্কে শুধু এটুকুই জানা ছিল যে জাপান অত্যন্ত সুসভ্য একটি আর্টের দেশ এবং ভারতের সঙ্গে জাপানের যে সাংস্কৃতিক সংযোগ গড়ে উঠেছে তা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীকে কেন্দ্র করে, কারণ জাপান থেকে ওকাকুরা ও তাঁর আট-নয়জন ছাত্র ভারতীয় চারুকলা ও স্থাপত্যশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিল্পচর্চার জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এসেছিলেন। জাপান যাত্রার অব্যবহিত আগে মুকুলের জীবনে যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবহ ঘটনাটি ঘটে তা হল এই যে, বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাব সেই সময় মুকুলের আঁকা দু-খানি ছবি আটশো টাকার বিনিময়ে কিনে নিলেন।

মুকুল দে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমার কথা' গ্রন্থে এই বিষয়টি সম্পর্কে লিখেছেন : "ব্যাপারটা অন্যের কাছে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু সেই বয়সে আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। বোধহয় শিল্পী হ'তে পারছি তারই একটা ইঙ্গিত পেলাম যেন। সেই যাত্রায় যখন জাপান থেকে আমেরিকা হয়ে দেশে ফিরি তখন আমেরিকা থেকে একটা প্রেস কিনে আনি সেই টাকা দিয়ে। প্রেসটা নড়বড়ে হয়ে গেলেও এখনও আমার কাছে আছে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য – এই গ্রন্থেই শিল্পী জীবনের প্রস্তুতিপর্বে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন – "যশের প্রতি, অর্থের প্রতি আকর্ষণ যদি পেয়ে বসে তবে জীবনে কোনদিনই সার্থকতা আসে না। অনেক পরিশ্রম ও চর্চা করে শিল্পীকে ডেসপ্যারেট হতে হয় কারণ শিল্পীর জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসে পদে পদে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত-অপরিচিত সকলেই দেখা যায় জ্বালা-যন্ত্রণা দিচ্ছে, অপমান করছে এবং হিংসায় উন্মত্ত – সর্বত্রই

রেষারেষি, জেদাজেদির একটা ব্যাপার চলেছে। অতবড় একজন শিল্পী ভ্যানগঘও সারাটা জীবন জুড়ে লোকের কাছ থেকে কতরকম প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, লাঞ্ছনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপই না সহ্য করেছেন! কতখানি মেহনৎ করলে একজন প্রকৃত আর্টিস্ট হওয়া যায় সে খবর একমাত্র আর্টিস্টরাই জানেন। শিল্পের জন্যই নিঃস্বার্থভাবে শিল্পীর জীবনকে বেছে নিতে পারলে তবেই প্রকৃত সৃষ্টি সম্ভব।" কলকাতায় আর্ট এগজিবিশন দেখে মুকুলের চোখের সামনে শিল্পজগতের যে বিশালতা উন্মোচিত হয়েছিল – জাপান যাত্রায় রবীন্দ্রসঙ্গী হওয়ার দরুন জাপানি আর্টিস্টদের সান্নিধ্যে এসে তার প্রকৃত মাহাত্ম্যের আভাস যেন আরো বিশালতর রূপ নিয়ে প্রসারিত হল। জাপানের শিল্পচর্চার ধারায় জাপানি আর্টিস্টদের আন্তরিক সহযোগিতায় মুকুল কীভাবে নিজের শিল্পী জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন সে কথা তাঁর 'আমার কথা' গ্রন্থে যেভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার কিছুটা পরিচয় এই লেখাটিতে পাওয়া যাবে।

১৯১৬ সালের মার্চ মাস। জাপান যাত্রার সূচনা হল 'তোশামারু' নামের একটি মালবাহী জাহাজে। সেই জাহাজে মানুষ-যাত্রী বলতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অ্যান্ড্রুজ, পিয়ার্সন ও মুকুল দে – এই চারজন মাত্র। জাহাজে অনবরতই টনটন লোহা-লক্কর, পাটের বস্তা বোঝাই হচ্ছে। অনেক বন্দরেই জাহাজ ভিড়ছে। মালবাহী জাহাজ বলে বন্দরে বন্দরে তার মাল তোলর, মাল খালাস করার আর বিরাম নেই। কাজেই জাপানে পৌঁছাতে সর্বসাকুল্যে একমাস লেগে গেল। রবীন্দ্রনাথের আগমনবার্তায় জাপানে রটে গেছে যে 'সেকেন্ড বুদ্ধ' আসছেন তাই বন্দরে বন্দরে সর্বত্র হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। জাপানের 'কোবে' বন্দরে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনার জন্য জাপানের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট ইয়োকোহামা টাইকান, পেন্টার কাটসুকা – এছাড়াও শান্তিনিকেতনের জুজুৎসু শিক্ষক কানো আর জাপানের প্রিন্ট কাওয়াগুচি। এঁদের মধ্যে মুকুলের সঙ্গে টাইকানের সম্পর্ক ক্রমশ নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। টাইকান তাঁকে 'ফুজিয়ামা মাউন্টেন' দেখাতে নিয়ে যান। এই 'লিভিং ভলকানো' এমনিতে বরফে ঢাকা হলেও মাঝে মাঝে আবার ধোঁয়া বেরতে থাকে। জাপানি আর্টিস্টদের কথা ছেড়ে দিলেও পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ আর্টিস্ট 'ফুজিয়ামার' বহুরকম ছবি এঁকেছেন। একদিন টাইকান আবার মুকুলকে নিয়ে গিয়ে 'নোডামাস' বলে এক জায়গায় হাজার বছরের প্রাচীন শিল্পকর্ম দেখালেন। সেখানে প্রকাণ্ড গোল্ডেন পাইন গাছ আঁকা ছিল আর সেখানকার এক বিখ্যাত হোটেলে বহু নামী শিল্পীর ছবি সংরক্ষিত ছিল – যার মধ্যে অধিকাংশ ছবি-ই টাইকানের আঁকা। এছাড়াও মস্ত বড় এক হলঘরে শৌখিন নানা জিনিসপত্রে প্রাচীন সব নিদর্শন সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে জাপানের ধনী গৃহস্বামীর বাড়ীতেও এরকম সুন্দর সুন্দর ছবির 'কালেকশন' দেখা যায় তবে জাপানি জাতটার সর্বত্রই একটা

সুন্দর পরিমিতি বোধ আছে বলে ওরা ঘরে একটি দুটি ছবির বেশি সাজিয়ে রাখে না। উদ্দেশ্য – যেটি দেখার সেটিকে সম্পূর্ণভাবে রসাস্বাদন করা। জাপানে প্রায়ই আর্ট এগজিবিশন হয়, আর যে প্রদর্শনীতে টাইকানের ছবি থাকে সেখানে ভিড় সামলাতে রক্ষীদের হিমসিম খেতে হয়। জাপানের প্রায় সমস্ত আর্টিস্টই ওঁর ছবিকে যে হিংসে করেন এতে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। কী সঙ্গীত-সাহিত্য-ভাস্কর্য, কী বিজ্ঞান-রাজনীতি সর্বত্রই এই প্রক্রিয়া আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। আর্টিস্টদের মধ্যে এটা আবার যেন বেশি ঘটে। টাইকান ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি অনুরাগী ছিলেন বলে ১৯০৬ সালে যখন ভারতে এসেছিলেন তখন কাশি থেকে তিনি যে পিতলের ঘড়াটি সংগ্রহ করে নিয়ে যান তার গায়ে খোদাই করা ছিল রাসলীলার ছবি। জাপানে থাকাকালীন মুকুল সুইস আর্ট স্কুলে আয়োজিত প্রায় একশো দেড়শো ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। পৃথিবীর নানাপ্রান্তে ঘুরে ঘুরে আর্টের বিষয় নিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে মুকুলের মনে হয়েছে জাপানই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো আর্টের দেশ। তাঁর কাছে প্যারিসের আর্ট পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেও তা যেন খানিকটা উগ্র আর তার পাশাপাশি জাপানের আর্ট অনেক সৌম্য। একটা গোটা দেশই কী করে আর্টের এরকম প্রতিভূ হতে পারে সেটা জাপানে না গেলে বিশ্বাস করা যায় না।

জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ইয়াকোহামা টাইকানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং রাজা। রাজপ্রাসাদ থেকে প্রতিদিন তাঁর জন্য দশ বারো বোতল ‘সাকে’ আসতো। সাকে জাপানের ‘বেস্ট ওয়াইন’। টাইকান আবার বেশি জল খেতেন না; চাল থেকে তৈরি হওয়া সাকেই খেতেন। টাইকান বছরে একটি বা দুটির বেশি ছবি আঁকতেন না। সেইসব ছবি আবার চার পাঁচ ভাঁজের ফোল্ডিং হতো। সারা বছরের সমস্ত সময়টা তিনি ঘুরে বেড়ান, স্টাডি করেন, তারপরে মগজে সংগৃহিত আইডিয়া ও মালমশলা মিলে মিশে রঙের মধ্যে দিয়ে এক একটা ‘মাস্টার পিস’ হয়ে নেমে আসে। জাপানে থাকাকালীন মুকুলও টাইকানের সঙ্গে জোট বেঁধে নানান জায়গায় ঘুরে শিল্পপ্রদর্শনী দেখেছেন। তাঁর কাছ থেকে টুকটাক ছবি আঁকা শিখেছেন। টাইকানের স্কেচ এঁকেছেন, পোর্ট্রেট করেছেন। একবার টাইকানের ছবি আঁকার বিশেষ একটা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রত্যক্ষদর্শী মুকুলতো বিস্ময়ে বিমুগ্ধ! ছবিটি ছিল উইলো গাছের নীচে ঘোড়া দানা খাচ্ছে আর পাশে সহিস শুয়ে ঘুমাচ্ছে। ছবিটি গোল্ডের উপর আঁকা কিন্তু ছবি টাইকানের কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছিল না। ছবির উপকরণগুলিকে পূনর্বার ব্যবহারের উপযোগী ও অক্ষত রেখে ছবিটি নষ্ট করতে চাইছিলেন বলে তিনি মুকুলের সামনেই আশ্চর্য এক অভিনব প্রক্রিয়ায় সিল্কের কাপড়ের ওপরে নিজস্ব

এক মৌলিক টেকনিক অবলম্বন করে ছবিটি বদলে দিলেন। মুকুলকে টাইকান তাঁর আঁকা অসামান্য দুটি ছবি উপহার দিয়েছিলেন যার অর্থমূল্য ছিল বিপুল। অর্থের বিনিময়ে মুকুল সে ছবিগুলি হারাতে চাননি কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে জাপানপর্ব শেষ করে আমেরিকায় যাওয়া ছিল বলে দেশে ফেরার সময় জাপান থেকে ছবিগুলি নিয়ে ফিরবেন মনস্থ করলেও শেষ পর্যন্ত সেই ছবি আর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সেই দুটি ছবির একটিতে ছিল বাঁশগাছ আর অপরটি কিয়োটার প্রাকৃতিক দৃশ্য।

টাইকানের শিল্পজ্ঞানের বিশালতা দেখে মুকুল যেমন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনিও তেমনি শিল্পের প্রতি মুকুলের আগ্রহ, নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও মুগ্ধতা দেখে তাঁকে তাঁর শিষ্য হওয়ার সম্মান দিতে চেয়েছিলেন। পঁচিশ, ত্রিশ বছরের বড়ো টাইকানকে মুকুল গু র মতোই শ্রদ্ধা করতেন, আর টাইকানও তাঁকে এতটাই ভালোবাসতেন যে স্কলারশিপ দিয়ে দশ বছর তাঁকে নিজের কাছে রেখে ছবি আঁকা শেখাতে চেয়েছিলেন। টাইকানের ব্যবস্থাপনায় টোকিও থেকে ইয়োকোহামায় গিয়ে মুকুল যখন বিশিষ্ট ধনী এবং শিল্পরসিক শিল্পী তোমিমারো হারার বাড়ীতে ওঠেন তখন তিনিও তাঁকে দশ বছরের স্কলারশিপ দিয়ে ছবি আঁকার জন্য নিজের কাছে রাখার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। টাইকান কিংবা তোমিমারো হারার প্রতিশ্রুতির মধ্যে কোনোরকম স্বার্থের নামগন্ধই ছিল না। আমেরিকার শিকাগোতেও মুকুল আর্ট শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ পেয়েছিলেন কিন্তু কোনোখানেই কবিগুরুর অনুমোদন না থাকায় সে যাত্রায় মুকুল স্কলারশিপের কোনোটিই নিতে পারেননি।

জাপানের বিখ্যাত শিল্পী সিমামুরা কানজানের প্রতি মুকুল এতটাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে ‘আমার কথা’ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন – ‘জাপানি শিল্পীদের কথা বলছি যখন তখন এই বেলা আর একজনের নাম না করলে পাপ হবে আমার।’ জাপানে বেশ কিছুদিন থাকতে থাকতে বহু প্রাচীন ও আধুনিক আর্টের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় তাঁর মন প্রাণ যেমন ভরে উঠেছিল তেমনি অনেক কিছু ভাবতেও শিখেছিলেন। জাপানের শিল্পীরা প্রাচীন আর্টকে যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিচর্যা করে, মর্যাদা দেয় তেমনি রক্ষাও করে, কিন্তু সেই হারানো পদ্ধতির মধ্যে আটকে থাকে না। তাঁরা আঙ্গিকের সঙ্গে শিল্পের অর্থের বিন্যাসকেও উন্নততর করার প্রচেষ্টায় নিরন্তর ব্যাপৃত থাকেন। তোমিমারা হারারার বাড়ীতে কিংবা অন্যত্র যেখানেই মুকুল টাইকান অথবা সিমামুরার ছবি দেখেছেন সেখানেই লক্ষ্য করেছেন যে শিল্পীরা ইউরোপীয়ান আর্টকে যেমন নকল করেননি তেমন প্রাচীন জাপানি আর্টকেও নয়। চিত্রকলার সর্বত্রই একটা বলিষ্ঠ নিজস্বতার অভিব্যক্তি আছে – এখানেই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব। ও দেশের শিল্পকলায় বাহুল্য নেই – আছে বিশালতা। কল্পনার বদলে জীবনসত্যকেই ওরা মূল্য দেয় বেশি। আর্টের প্রতি ওদের আনুগত্যটা এসেছে শিল্পের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা থেকে – আভিজাত্যের অহংকার থেকে নয়। জাপানের আর্টের সার্থকতার গোপন সূত্রটি এখানেই। জাপানের আর একটি যে বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় তা হচ্ছে আর্টকে সুরক্ষিত রাখার জন্য

ওদের আন্তরিক প্রচেষ্টা। জাপানের চারিদিকে জল। ফুজিয়ামা, ভূমিকম্পের মত দৈব-দুর্বিপাক নিয়ে ওদের ঘরকন্না। তাই বাড়িঘর সব কাঠ দিয়ে তৈরি। কাঠের বাড়ি – এই ভাঙছে, এই মেরামত করা হচ্ছে কিন্তু আর্টের সংগ্রহ সুরক্ষিত রাখার যে চমৎকার পদ্ধতি ওরা নিয়েছে তাতে হাজার বছরের পুরোনো ছবি আজও অক্ষত থেকে গেছে। আর্টের সামগ্রী সংরক্ষণ করার জন্য ওরা প্রায় এক ফুট মোটা স্টীলের দেওয়াল দিয়ে এমন ঘর তৈরি করে রেখেছে যে তার ভিতরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পৌঁছতে পারেনা। জাপানে এইরকম একটি স্টোররুম দেখার সৌভাগ্য মুকুলের হয়েছিল। সেখানে অখ্যাত এক নাম না জানা শিল্পীর আঁকা বহু পুরাতন এমন একটি ড্রাগনের ছবি তিনি দেখেছিলেন যা দেখলে মনে হয় সর্বদাই ফোঁস ফোঁস করছে। আবার এমন ছবিও দেখেছেন যার বিষয়বস্তু শুধুমাত্র বাঁশগাছ। কিন্তু ছবিটি দেখলেই মনে হবে তার পাতাগুলি যেন সবসময়ই মৃদু বাতাসে কাঁপছে। জাপানের শিল্পীদের সর্বত্রই এইরকম দুর্দান্ত-বলিষ্ঠ একটা মৌলিকতা আছে যা একান্তভাবে তাঁদের নিজস্ব।

ইয়াকোহামা থেকে একবার টোকিওতে টাইকানের বাড়ীতে গিয়ে মুকুল দেখেন যে কিছু ছেলে মেয়ে তাঁর বাড়িতে ধোয়া-মোছা ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক ও বাগানের কাজকর্ম করে চলেছে। দেখেশুনে মুকুলের মনে হয়েছিল যে তারা বুঝি কাজের লোক। কিন্তু পরে জানতে পারেন তারা সকলেই জাপানের নামজাদা আর্টিস্ট এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ রীতিমতো স্কলার। সেইসব ছাত্রছাত্রীরা টাইকানের কাছে ছবির কাজকর্ম শিখতে এসেছিল। অত্যন্ত বলিষ্ঠ তাদের হাতের কাজ। ব্লু-কেন নামে একটি মেয়ে এদেরই মধ্যে থেকে মুকুলকে ফুলসমেত ফুলদানির একটি ছবি এঁকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই প্রথম মুকুল উপলব্ধি করলেন মানুষ আসলে কোথায় বড়। টাইকানের অনুরোধে গুরুদেব সোনালি সিল্কের ওপরে কালি তুলি দিয়ে টাইকানকে লিখে দিয়েছিলেন :

‘হে মহা টাইকান
বিশ্বের অন্তরে তব স্থান।
তব চিত্রপটে
বিশ্বের প্রাণের কথা রটে।’

টাইকান যে ছবি আঁকতে আঁকতে চিৎকার করে গেয়ে উঠতেন :

‘কি কু রাকা চাকা হোকো
চৈতো কিনায়ো
হোঃ হো রা আ কিন নাম নাম।’

তা অনেকদিন পর্যন্ত মুকুলের স্মৃতিতে এতটাই উজ্জ্বল হয়েছিল যে সেই সুর প্রায়শই তার কানে বাজতো। জাপান থেকে চলে আসার কিছু আগে গুরুদেবকে ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচন করার প্রস্তাব উঠেছিল কিন্তু অ্যান্ড্রুজ তাতে সায় দেননি কারণ তাঁর মনে হয়েছিল তাহলে হয়তো সারাজীবনের জন্য রবীন্দ্রনাথ জাপানেই বন্দী হয়ে থাকবেন। অবশ্য জাপান থেকে আমেরিকায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিবিধ বক্তৃতায় জাপান সম্পর্কে কিছু বিতর্কিত অভিমত পোষণ করেছিলেন বলে পরবর্তীকালে জাপানের নাগরিক কবিগুরুর প্রতি বিরূপ হন। একারণে আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে জাপানে কেউই আর তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন না। একমাত্র ব্যতিক্রম সেই বিখ্যাত উদারচেতা শিল্পী ইয়োকোহামা টাইকান।

পিয়ার্সন চেয়েছিলেন বিদেশযাত্রায় রবীন্দ্রসঙ্গী মুকুল যেন গুরুদেবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দেশের আর্ট সম্পর্কিত কিছু তথ্যাদি জেনে শুনে নিজে তা প্রয়োগ করার জন্য সচেষ্ট হন তাই টাইকানের দেওয়া স্কলারশিপের প্রস্তাব পিয়ার্সন সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু গুরুদেব তা নাকচ করে দিলেন। সে যাত্রায় মুকুলের বিদেশে থেকে যাওয়ার প্রসঙ্গ যতবারই উঠেছে গুরুদেব ততবারই একই কথা বলেছেন – 'না, আমি ওর বাবার কাছ থেকে ওকে নিয়ে এসেছি, বাবার কাছে ফিরিয়ে দেবো।' আমেরিকা থেকে ফেরার পথে মুকুলকে নিয়েই এ ব্যাপারে পিয়ার্সনের সঙ্গে গুরুদেবের যে কথা কাটাকাটি হল তা প্রায় ঝগড়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেল বলে পিয়ার্সন আর ভারতবর্ষে ফিরলেনই না। আমেরিকা থেকে ফেরার পথে জাপানেই থেকে গেলেন। জাপান ছেড়ে চলে আসার সময় টাইকান, তোমিমারো হারা, সিমামুরা কানজান – এঁদের সান্নিধ্য ও সাহচর্যের কথা ভেবে মুকুলের মন ভারাক্রান্ত। সিমামুরা কানজান ছিলেন রয়্যাল আর্টিস্ট। সোজা কথা নয়। থাকতেন একটি পাহাড়ে। স্রেফ রঙ গুলে দেওয়ার জন্য তাঁর আট-দশজন ছাত্রছাত্রী ছিল। মুকুলকে তিনি ফুজিয়ামার ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। আর একজন জাপানি আর্টিস্টের নাম হায়িমাতো গাতো। ১৯০৮-১০ সালে তিনি ওকাকুরার সুপারিশে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসেছিলেন। অবন ঠাকুর তাঁকে তাজমহল, নূরজাহান প্রভৃতি মোগলাই ছবি উপহার দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানা ছবি ছিল আর একজন নামজাদা জাপানি আর্টিস্টের কাছে যাঁর নাম কাৎসুতা। টোকিওতে কাৎসুতার ছবি বিক্রির একটি দোকান ছিল। দোকানটি আমাদের দেশের পানের দোকানের মতো ছোটো আকারের। অথচ ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় – কী বিক্রি! আর হবে নাই বা কেন? জাপানে আর্টের যে চাহিদা তা নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর ব্যাপার। আমাদের দেশের মতো শুধুমাত্র বড়মানুষি দেখানোর জন্য ছবি কিনে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে ধুলো চাপা দেওয়া নয়।

জাপানের শিল্পমাহাত্ম্য দেখে আর ভারতীয় শিল্পের স্নিগ্ধতার কথা ভেবে মুকুলের কেবলই মনে হতে লাগলো – এশিয়ায় যদি চীন-জাপান-ভারত সৌহার্দ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকে

তবে সে শুভসংযোগের কোনো তুলনা হবে না। শিল্প-সংস্কৃতির দিক দিয়ে চীন-জাপান-ভারতের একত্রে থাকার গুরুত্বটা মুকুল আজীবন অনুভব করে গেছেন। অবশেষে জাপান থেকে একই পথে পাড়ি দিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়মের কাছে বাবুঘাটে এসে জাহাজ ভিড়লো। অভ্যর্থনার জন্য অনেকেই উপস্থিত; তাঁদের মধ্যে মুকুলের বাবা কুলচন্দ্র দে-ও ছিলেন। সকলেরই প্রশ্ন – পিয়ার্সন কোথায়? মুকুল ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে দেশে ফিরলেন আর ১লা জুলাই ১৯১৭তেই মুকুলের পিতৃবিয়োগ হল। গুরুদেব পিয়ার্সনের সঙ্গে বচসা করে মুকুলকে ফিরিয়ে এনেছিলেন বলেই বাবার অন্তিমশয্যায় তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন – শেষকৃত্য করতে পারলেন।

পিতৃবিয়োগের পর মুক্ত মুকুল অজানা অজন্তার পথে পাড়ি দিলেন। ভারতীয় শিল্পকে যে ভালোবাসে তার কাছে অজন্তা মহাতীর্থ, পরম পুণ্যভূমি। মুকুলের প্রথমবারের অজন্তা যাত্রা ছিল বিনা প্রস্তুতিতে শুধুমাত্র মনের জোরে অজন্তাকে চোখের দেখা দেখতে যাওয়া। আর সেখানে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে একদল জাপানি আর্টিস্টের দেখা পেয়ে তাদের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সেই জাপানি আর্টিস্টের দলের মধ্যে ছিলেন মুকুলের পূর্বপরিচিত কাম্পো আরাই। কাম্পো আরাই টাইকানের মতো ওকাকুরা ঘরাণার শিল্পী। এসেছিলেন জোড়াসাঁকোতে অবন ঠাকুরের কাছে ইণ্ডিয়ান আর্ট সম্বন্ধে তালিম নিতে। আবার কাম্পো আরাই-এর কাছেই নন্দলাল বসু কালি তুলির কাজ শেখেন। একটা আর্টের টেকনিককে ডেভেলপ করে সুষ্ঠুভাবে টেনে নিয়ে যেতে কাম্পো আরাই-এর রীতিমত দক্ষতা ছিল। নন্দলাল বসু যে শিল্পীর কাছে কালি তুলির রেওয়াজ করতেন সেই কাম্পো আরাই মুকুলকে অজন্তা গুহার দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। অজন্তা গুহা প্রথম দেখার সেই অভূতপূর্ব অনুভূতির কথা মুকুল তাঁর 'আমার কথা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন : 'প্রাকৃতিক উপত্যকাকে ঘিরে পাহাড়ের অসমান বেড়া দেখে মনে হল যেন শিবের মাথার চাঁদ। তার পাশ দিয়ে নেমে গেছে এক অপূর্ব ঝরনা। মুগ্ধ হয়ে গেলাম তাঁর কুলকুল শব্দ শুনে। দেখার পর আমার মনে হল এ যে আমার কল্পনাকেও হার মানালো। প্রবেশ মুখের চমৎকার কারুকার্য করা নীলাভ বেগুনি রঙের প্রস্তরকে অতিক্রম করতেই সারবন্দি গুহামন্দির। কাম্পো আরাই আর আমি ধ্যানস্থ হয়ে যেন সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম, আমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন। আমার সমস্ত পথশ্রম হাজার গুণ উশুল হয়ে গেল ওই এক পলকের দৃষ্টিতে।'

শিল্পতীর্থ অজন্তায় এসে মুকুলের চোখের সামনে যেমন শিল্পজগতের সিংহ দরজা খুলে গেল তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে দেশের মাটিতে জাপানি আর্টিস্টদের সান্নিধ্য ও সাহচর্যে আসতে পেরে তাঁর শিল্পী জীবনের প্রস্তুতি পর্বের পটভূমিকা আরো প্রসারিত হল। পরিচিত হলেন সামুরা, আরাইসান প্রমুখ জাপানি দলের শিল্পীদের সঙ্গে। সামুরার কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, তাঁদের আগেও জাপানি শিল্পীরা এসে অজন্তার ফ্রেস্কো কপি করে নিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে ভূমিকম্পে। ভাগ্যক্রমে সামুরার ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা নিজস্ব ফ্রেস্কোগুলি ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেছে। অধ্যাপক সামুরা যখন অসংখ্য ছবি তুলেছেন, অজন্তার নকশার কপি করেছেন তখন মুকুল তাঁদের আতিথ্য গ্রহণের কৃতজ্ঞতায় ও নিজের শৈল্পিক মনের চাহিদা মেটাতে তাঁদের ছবি আঁকার কাজে যৎসামান্য সাহায্য করেছেন। অজন্তার এক নম্বর গুহার 'দি টেম্পটেশন অফ বুদ্ধা'-র একটা ফ্রেস্কো যখন আরাইসন কপি করছিলেন তখন তাঁর কাজের নিষ্ঠা দেখে মুকুল মুগ্ধ হয়েছেন। দেখেছেন জাপানি শিল্পীরা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কী নিরলসভাবে কাজ করে যান। কাজ করার সময় ওঁরা কথা বলেন না। কাজের সময় কথা না বলাটা যে কত বড়ো সুবিধার সেটা মুকুল এঁদের দেখেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। জাপানি শিল্পীরা যে আর্টের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ সে তো আর মুকুলের কাছে গল্পকথা নয়, একেবারে নিজের চোখে দেখা। নিজেদের দেশের আর্টকে সমৃদ্ধ করার জন্য অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেও জাপানিরা সারা পৃথিবী ঘুরে আর্টের কত রকম নতুন টেকনিক শিখে রঙ তৈরির মাল-মশলা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে যে সেটা মুকুলের শিল্পী জীবনের প্রস্তুতি পর্বের পটভূমিকায় একটা শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা ছিল।

জাপানি শিল্পীদের সাহচর্যে অজন্তার এক গুহা থেকে অন্য গুহায় ঘুরে বেড়িয়ে অজন্তার অপূর্ব সব খোদাই ও কারুকাজ মণ্ডিত চিরন্তন শিল্পকে শুধু চোখের দেখা নয় – অন্ধকার গুহার অভ্যন্তরে গ্যাসের আলোতে ফ্রেস্কো কপি করে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ এক ধরণের টেকনিকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই মুকুল দে-র মনে অজন্তার সব বড়ো বড়ো ফ্রেস্কো কপি করে রাখার ইচ্ছেটা জেগেছিল। মুকুল প্রথমবারের অজন্তা যাত্রায় অল্পদিন থেকেই জাপানি শিল্পীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলেন তাই ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি ভালোমতন মানসিক ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতি নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় দফায় অজন্তা যাত্রা। অজন্তার অপরূপ কীর্তি মহাকালের করাল স্পর্শে পুরোপুরি ধূলিস্যাৎ হয়ে যাওয়ার আগে যেটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল তাকে রক্ষা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই অজন্তার পথে তাঁর একক যাত্রা। চারুকলার পূজারী শিল্পীরা স্বভাবতঃই একাকী বলে দ্বিতীয় বারের অজন্তা পরিক্রমায় মুকুল নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রায় দেড়-দুই বছর কাটিয়েছিলেন। অজন্তায় সারাদিনই প্রায় কাজ করতেন। অনেক সময় মুড এসে গেলে শেষরাতেও ফ্রেস্কো কপি করেছেন। রাতের অন্ধকারে গুহা থেকে গুহান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে স্টাডি করতে করতে তাঁর মনে হতো তিনি যেন

পৃথিবীর বাইরে অন্য একটি জগতে বিবরণ করছেন। পরিণত বয়সে সেই সময়টায় স্মৃতি-রোমন্থন করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল : 'দি মেরি অ্যাণ্ড ওয়ান্ডারফুল টাইম ইন মাই লাইফ'। সেই দু-একটি বছর তিনি জীবনের পরম আনন্দ পেয়েছিলেন কারণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র আর্টকে নিয়ে বেঁচে থাকা যে কী বস্তু সে কথা তিনি তখনই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সে কারণে অজন্তা পর্ব শেষ করে প্রত্যাবর্তনের সময় 'আমার কথা' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন : 'অজন্তা থেকে চলে আসতে সত্যিই আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। বড়ো কষ্টের মধ্যে দিয়ে তাকে ভালোবেসেছিলাম আমি। গোরুর গাড়িতে যখন আমার জিনিসপত্র আসছে পিছনে, আরো পিছনে চিরদিনের মতো রয়ে গেলো অজন্তা, আমার তখন সত্যি সত্যি চোখ ঝাপসা।'

অতীতের ভিত্তিচিত্র বা ম্যুরালের গৌরবগাথা অনেক আগেই প্রায় অস্তমিত; তার পরম্পরা আজ প্রায় কলা-মহলের আলোচনাচক্রেও স্থান পায়না। ভিত্তিচিত্রের গৌরব গাথা অবস্থিত হওয়ার পর অণুচিত্র বা মিনিয়েচার পেন্টিং ভারতীয় শিল্পকলা বিকাশের ইতিহাসে সিংহভাগ জুড়ে ছিল। এরপর আসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী বিস্তার যার কালো ছায়া ঢেকে দেয় ভারতীয় সংস্কৃতির নিজস্ব বিকাশ ভাবনাকেও অতঃপর অনুচিত্র ঘরানার যে সুরধ্বণি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রবৃন্দের সমবেত তুলিতে, মুকুল দে ছিলেন তাদেরই একজন। বাঙালি যে বিস্মৃতিপ্রবণ জাতি, আর ইতিহাসের প্রতি অবহেলায় তার জুড়ি মেলা ভার – একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তারও যে ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে ঘটে তার নজির আছে মুকুল দে-র দুই দৌহিত্র সত্যশ্রী ও শিবশ্রী উকিলের হাতে গড়া ছবির সংগ্রহশালায়। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার কিংবদন্তী মুকুল দে-র এই দুই সুযোগ্য উত্তরসূরি ২০০২ সালে শান্তিনিকেতনে তাঁর বাড়ি 'চিত্রলেখা'-র একাংশে গড়ে তুলেছেন 'মুকুল দে আর্কাইভস্'। ২০০৩ সালে আর্কাইভসের ওয়েবসাইট-ও তৈরি করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে মুকুল দে-র মৃত্যুর পরেই তাঁর বিভিন্ন ছবি, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, চিঠি ও বিভিন্ন ক্যাটলগ সংগ্রহের কাজটি শুরু হয়। আর্কাইভসের উদ্যোগে এবং সত্যশ্রীবাবুর সম্পাদনায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে 'জাপান থেকে জোড়াসাঁকো : চিঠি ও দিনলিপি (১৯১৬ - ১৯১৭) এবং মুকুল দে-র একমাত্র কন্যা মঞ্জরী উকিলের লেখা 'ফরেন ইনফ্লুয়েন্স অন ইন্ডিয়ান কালচার (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ - ৩২০ খ্রিষ্টাব্দ)'। সম্প্রতি মুকুলদের সংরক্ষিত যাবতীয় কাগজপত্র ডিজিটালাইজেশনের কাজ ও শিল্পীর করে যাওয়া টেরাকোটা মন্দিরের ফটো ডকুমেন্টেশন প্রকাশেরও তোড়জোড় চলেছে।

চিত্র পরিচিতি : মুকুল দে-র ফটোগ্রাফ, 'আমার কথা' প্রচ্ছদ এবং শিল্পী মুকুল দে-র কয়েকটি সৃষ্টি।